International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.57-64
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.57-64

শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগ: একটি সম্যক্ আলোচনা

সৌরভ মজুমদার

রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, কাটোয়া কলেজ, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
এবং
পিএইচ. ডি. রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Sri Aurobindo's philosophy of purnayoga is a novel addition to the spiritual world. In this school of thought, the development of the entire universe is not an individual goal. Purnayoga has multidimensional aspects present in our lives. Purnayoga is a synergistic yoga because there is a combination of yogas such as Jnanyoga, Bhaktiyoga, Karmayoga, etc. Sri Aurobindo integrated all forms of yoga to achieve the ultimate goal. He believed that the intergration of all the yogas mentioned in the Gita helps to transform human life into heavenly life. He emphasized the integration of all areas of yoga, not just one, for the overall development of a person. He felt the need for this triple transformation of the human soul, mental, spiritual and supra-mental, in the development of Purnayoga. Therefore through the perfection of physical, mental and spiritual harmony we attain perfection from the lower level to the higher level and to the highest level.

Key words: Purnayoga, Hathayoga, Rajyoga, Jnanayoga, Karmayoga.

মূল বিষয়বস্তু: শ্রী অরবিন্দ ছিলেন নবজাগরণের উজ্জ্বল এক নক্ষত্র। ভারত তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অরবিন্দ ঘোষের অবদান বহু ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি ছিলেন বহুমুখী কর্মশক্তি সম্পূর্ণ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। শ্রী অরবিন্দ ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনন্য সাধারণ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, প্রথাগত জ্ঞানের বিরুদ্ধাচারী চিন্তক, ক্রান্তদর্শী সাহিত্যিক ও মহাকবি, মানবতার ঐক্যে বিশ্বাসী দার্শনিক, প্রাচ্য - পাশ্চাত্যের মধ্যে মেলবন্ধনকারী উচ্চমার্গের সাধক ও মহাযোগী। মহাযোগী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার জগতে এক অভিনব সংযোজন হল পূর্ণযোগ। শ্রী অরবিন্দের যোগের যা কিছু বৈশিষ্ট্য এই 'পূর্ণযোগ' কথাটির সম্যক্ আলোচনা করলেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রী অরবিন্দের মতে পূর্বতন সকল যোগের সার ও প্রক্রিয়া সংগ্রহ করেই পূর্ণযোগের অবয়ব গঠিত হয়েছে। তবে লক্ষ্য, দৃষ্টিকোণ, এবং পদ্ধতি প্রয়োগে তার অভিনবত্ব রয়েছে।

শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগের লক্ষ্য হল পূর্ণসত্যের অখণ্ড অনুভূতি। ঐ অখণ্ড সত্যানুভূতির আলোতে দেখা যায় যে কর্ম ও জ্ঞান, জগৎ ও ব্রহ্ম, জীবন ও নির্বাণ দুই-ই সত্য। তাই "পূর্ণযোগের চেষ্টা হইল জ্ঞানের

যূপকাষ্ঠে কর্মকে বলিদান করা নয়, জ্ঞানের আলোতে কর্মকে রূপান্তরিত করা; ব্রহ্মলাভের আগ্রহে জগৎকে উপেক্ষা করা নয়, ব্রহ্মের বলে বলীয়ান হইয়া জগতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করা; নির্বাণের অধীর আকাঙ্ক্ষায় জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত করা নয়, নির্বাণলব্ধ প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তিতে পার্থিব জীবনকেই অমৃতময় করিয়া তোলা।"[১]

শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগে লক্ষ্য ও পথ, উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী - এই উভয় দিকের এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন ঘটেছে। শ্রী অরবিন্দের মতে, প্রাচীন যোগ প্রণালীতে সত্যকে সমগ্রভাবে লাভ করতে পারে নি, আংশিকভাবে পেরেছে, আবার অনেক সময় পরস্পরবিরোধী ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা গিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা সমগ্র দৃষ্টি নেমে এলেও সাধনার বাস্তবক্ষেত্রে যেন তা অন্তরালে সরে গেছে। যেমন - পাতঞ্জলযোগে বলা হয়েছে - যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ - এই স্থানে পতঞ্জলি সত্যকে এক নির্গুণ, নির্বিশেষরূপে উপলব্ধি করেছেন। তিনি এমন এক অবস্থার সন্ধান দিয়েছেন যেখানে জীবনের সমস্ত কর্ম-কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়, যেখানে পৌঁছালে প্রকৃতি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে দৃষ্টিপথ থেকে সরে যায়, এবং আত্মা নিজেকে নিজের মধ্যে মগ্ন রাখে। শঙ্করাচার্যও এরূপ নির্গুণ, নির্বিশেষ অবস্থারই সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবনে" বিশ্বের কর্মপ্রবাহের অতীত এমন এক অবস্থা যেখানে পৌঁছালে জীবন এক মায়ামরীচিকায় পরিণত হয়, কর্মের অথবা ভক্তির আর কোন অবকাশ থাকে না। কারণ কর্মের উদ্দেশ্যে জীবনকে সমৃদ্ধ করা, কিন্তু ব্রহ্মবিদের কাছে জীবন হয়ে পড়ে তুচ্ছ, অলীক, তাই সেখানে কর্মের অবকাশ থাকে না। আর ব্রহ্ম যেখানে নির্বিশেষ সত্তারূপে বিরাজমান সেখানে কে কাকে ভক্তি করবে? তাই ভক্তিরও স্থান সেখানে নেই। ভক্ত ও ভগবান সেখানে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। কেবল সত্তা দিক থেকে নয়, প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকেও উভয়ের প্রভেদ মায়াবাদে স্বীকৃত নয়। বুদ্ধদেবের নির্বাণ বা পরিনির্বাণও ব্রহ্মবিলয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু নয়। অবশ্য অদ্বৈতবেদান্তের শঙ্করপন্থীরা যেখানে পারমার্থিক সত্তাকে - 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ বলে নির্দেশ করছেন, বুদ্ধদেব সেখানে এক মহাশূন্যের কেবল ইঙ্গিত দিয়েছেন। বুদ্ধদেব শূন্য বলতে এমন এক অবস্থা কে বুঝিয়েছেন তাহল পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দের অবস্থা, যা আমাদের বুদ্ধি মনের কাছে এক অনন্ত অনধিগম্য শূন্যতা, যে শূন্যতা প্রকাশ করার ভাষা হল মৌন। আবার অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করাচার্য বলেন - "অর্নিবচনীয় অবাঙমনসোগোচরঃ" অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত এবং ভাষায় প্রকাশ যোগ্য নয়।

পতঞ্জলি, শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব - এরা যেমন এক নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ অবস্থায় সত্যকে উপলব্ধি করেছেন তেমনি রামানুজ, বল্লভ - এরা আবার সত্যের অনন্ত গুণ সম্পন্ন বিচিত্র লীলাময় রূপ দেখে ভক্তি ও আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। তাদের এই সত্য-উপলব্ধিকে অস্বীকার করা যায় না। মানুষের বুদ্ধি যেমন ভগবানকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় রূপে দেখতে চায়, তাঁর ভোগপিপাসু প্রাণ ও কর্মপ্রবৃত্তিও তেমনি ঈশ্বরকে সগুণ লীলাময় রূপে পেতে চায়। বুদ্ধির এরূপ দাবীকে যেমন উপেক্ষা করা যায় না, তেমনি প্রাণের ক্ষুধাকেও অগ্রাহ্য করা কঠিন। প্রাণের দাবি উপেক্ষা করে একমাত্র বুদ্ধি কে যেমন মেনে নেওয়া অথবা বুদ্ধি কে অস্বীকার করে শুধু প্রাণাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করা, এ উভয়ই সত্যের আংশিক অনুভূতি এবং একদেশদর্শীতা বলে শ্রী অরবিন্দ মনে করেন। অবশ্য শ্রী অরবিন্দ এরূপ বলেন না যে, ঐরকম খণ্ড অনুভূতির কোন গুরুত্ব নেই। তার মতে আগে মানসিকস্তরে খণ্ড অনুভূতি লাভে মনকে আধ্যাত্মরসে আপ্লুত করতে হয়। তারপর উপরে ওঠার কথা। শ্রী অরবিন্দের কাছে এই ওপরে ওঠার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উপরে ওঠার অর্থ অতিমানসে আরোহণ। তাই তিনি গীতা ও উপনিষদের গভীরতম অনুভূতির প্রতি

অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন - ভগবান নির্গুণ হয়েও গুণী- "নির্গুণোগুণী" নিষ্ক্রিয় হয়েও সক্রিয়। ব্রহ্ম নির্গুণ ও গুণী, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় এই উভয় অবস্থায় অতিক্রম করে এক পরম রহস্যময় সত্তা, কিন্তু তিনিই আবার যুগপৎ বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশিত হয়ে আপনার যোগৈশ্বর্য বিস্তার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে সত্যকে এই রূপ সমগ্রভাবে দেখলে আমরা এক ব্যাপক সমন্বয়ের দৃষ্টি লাভ করব, যার ফলে আমাদের সত্তার প্রত্যেক অঙ্গ এক দিব্য সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে উঠবে।

পূর্ণযোগ যেমন সত্যকে সগুণ, নির্গুণ, সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এবং পরাৎপর, ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম এই সকল অবস্থার উপলব্ধি করতে চায়, এক থেকে অপরকে বিচ্ছিন্ন করে অথবা একের কাছে অপরকে বলিদান করে নয়, সকলকে একই অখণ্ড সত্যের বহুপ্রকাশ রূপে, তেমনি আবার ব্রহ্মকে দেখতে চায় শুধু তাঁর বিশ্বাতীত অর্নিবচনীয় স্বরূপে নয়, বিশ্ব মাঝে এবং ব্যক্তির অন্তর্যামী রূপে। শ্রী অরবিন্দের মতে "এই উপলব্ধি একাধারে বিশ্বাতীত (transcendental), বিশ্বগত (cosmic or universal) এবং ব্যষ্টিরূপী (individual)।"[২] ভগবান যেমন সকল নামরূপ অতিক্রম করে নিজের স্বরূপে অবস্থিত এক বিরাট রহস্য, তেমনি আবার তিনিই নামরূপের মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন নিজ আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রেরণায়, এবং তিনিই আবার ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে নিজেকে এক নতুন ছন্দে লীলায়িত করে তুলতে তৎপর। একদিকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" যেমন সত্য তেমনি আবার "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "অহং ব্রহ্মোহস্মি" অনুরূপ ভাবে সত্য। প্রাচ্য বিশেষ ভাবে সাধনা করেছে ভগবান তাঁর অবাঙ্ মনসোগোচর সচ্চিদানন্দ রূপে উপলব্ধি করতে, কিন্তু সকল সময় এবং সর্বক্ষেত্রে একান্তভাবে ঐ বিশ্বাতীত সত্যকেই লাভ করতে গিয়ে সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় ছন্দকে উপেক্ষা করতে চেয়েছে, বিসর্জন দিতে চেষ্টা করেছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে। আবার বিপরীত দিকে পাশ্চাত্যে ভগবানকে বিশেষ ভাবে দেখতে চায় বিশ্বের ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে। কিন্তু ভগবানের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায়, পাশ্চাত্যে ভগবানকে হারিয়েছে নাম রূপের কঠিন আবরণের মধ্যে, জীবনের কর্মকোলাহলের মধ্যে, এবং প্রকৃতি ও মানুষকে একান্তভাবে বড় করে যুক্তিবাদ ও বস্তুতন্ত্রের পথে আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে। শ্রী অরবিন্দ চাইছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বিরুদ্ধ আদর্শের সমন্বয়। ভগবান সব কিছুকে অতিক্রম করেও আবার সব কিছুর মধ্যে প্রকট হয়ে আছেন নিজেকে এক নতুন ছন্দে প্রকাশ করতে। বিশ্ব সেই আত্মপ্রকাশের আয়তন, আর ব্যক্তি সেই আত্মপ্রকাশের কেন্দ্র। ভগবানকে এরূপ পূর্ণভাবে বা সমগ্রভাবে দর্শন করাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। পূর্ণযোগীর আকাঙ্ক্ষা অনন্তের সাথে যুক্ত হয়ে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী হওয়া আবার অনন্ত শক্তির যন্ত্র হয়ে দিব্যকর্মের প্রবাহে বিশ্বকে এক দিব্যধামে পরিণত করা। পূর্ণযোগীর জীবনে একদিকে থাকে প্রাচ্যের আত্মপ্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে আবার থাকে পাশ্চাত্যের বিরামহীন অক্লান্ত কর্মতৎপরতা। ঐ কর্মের প্লাবন প্রকৃতিকে মানুষের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োজিত করে না, তাকে এক দিব্য রূপান্তরের পথে নিয়ে যায়।

শ্রী অরবিন্দ 'পূর্ণযোগ'এ পূর্ণতা বলতে বোঝোন ভাগবত পূর্ণতা, আত্মার পূর্ণতা। এই অর্থে, "পূর্ণতা ভাগবত সত্তার স্বরূপ, ভাগবতী প্রকৃতির ধর্ম।"[৩] শ্রী অরবিন্দের মতে মানুষ পূর্ণতার প্রয়াসী, সে অপূর্ণ। কিন্তু তার গন্তব্যস্থল হল পূর্ণতা। আত্মার এরূপ পূর্ণতা আসে পূর্ণযোগ অভ্যাসের দ্বারা। পূর্ণযোগের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে - এর লক্ষ্য শুধু দেহ, প্রাণ ও মনের গণ্ডি অতিক্রম করে এক পরম সমাধি অবস্থা লাভ করা নয়, সমগ্র সত্তাটির সহায়ে ভগবানকে উপলব্ধি করা। আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে - দেহে, প্রাণে, মনে তাঁর আনন্দঘন রূপ কে প্রতিষ্ঠা করা। পূর্ণযোগে তাই আরোহণের (ascent) সঙ্গে সঙ্গে অবরোহণের (descent)- এর প্রয়োজন আছে। শ্রী অরবিন্দ বলেন, "পূর্ণযোগ আরোহণ ও অবরোহণের দ্বয়ী

গতিস্বরূপ।"[৪] একদিকে যোগী যেমন আধ্যাত্ম-উপলব্ধির সমুচ্চশিখরে উঠে যাবেন, অপরদিকে আবার তুরীয় লোক থেকে সচ্চিদানন্দের বিজ্ঞান শক্তিকে নামিয়ে এনে কার্যকরী করবেন আমাদের সত্তার নিম্ন স্তর সমূহে। এতে সাধক যেমন চেতনার উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে আরোহণ করেন, তেমনি সেই সকল পর্যায়ের শক্তিকে মন, প্রাণ ও দেহে নামিয়ে আনেন। এর ফলে দেহ, প্রাণ ও মনেরও এক অপূর্ব রূপান্তর ঘটে, সমগ্র সত্তাটি ভাগবত ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠে, মানুষের মধ্যেই জন্ম নেবেন ভগবান তাঁর বিচিত্র ঐশ্বর্য নিয়ে।

পূর্ণযোগের ফল যেমন বিচিত্র ও অখণ্ড, তেমনি তার সাধন প্রণালীও এক মহাসমন্বয়ে উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে বহু প্রকার যোগ পন্থার জন্ম হয়েছে। শ্রী অরবিন্দের বিভিন্ন রচনায় যে সকল যোগের উল্লেখ পাই তাহল - জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, হঠযোগ এবং তান্ত্রিকযোগ। প্রত্যেক যোগ পথে সত্যকে এক বিশেষ উপায়ে উপলব্ধি করার প্রয়াস করা হয়েছে। অনেকের মতে এই সকল বিভিন্ন যোগ পদ্ধতি একই গন্তব্যে পৌঁছাবার বিভিন্ন পথ। আমরা যে পথেই যাত্রা শুরু করি না কেন অবিচলিত হয়ে একাগ্র চিত্তে অগ্রসর হলে অখণ্ড সত্য স্বরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করব। তবে সত্য এক হয়েও অনন্তরূপী, বিচিত্র,- অখণ্ড হয়েও বহুল প্রকাশময়। তাই সত্যকে আমরা কিরূপে দর্শন করব, ভগবানকে তাঁর কোন বিশেষ অবস্থায় উপলব্ধি করব, তা অনেকাংশে নির্ভর করে আমাদের সাধন পদ্ধতির উপর। সাধক যেভাবে ভগবান কে প্রার্থনা করেন, ভগবান সেভাবে সে রূপেই তার কাছে আবির্ভূত হন। তাই শ্রী অরবিন্দ বলেন ভগবানকে সমগ্রভাবে জানতে ও লাভ করতে হলে সাধন-ধারার মধ্যেও একটা ব্যাপক সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। তাঁর পূর্ণযোগ এরূপ এক সমন্বয়মূলক যোগপন্থার সন্ধান দেয়।

জ্ঞানযোগে বলা হয় মানুষের সত্তার মধ্যে আছে চেতনা, বুদ্ধি। বুদ্ধির কাজ হল চিন্তা, জ্ঞান হল চেতনার ক্রিয়া। এই জ্ঞানের সাহায্যে ঈশ্বরের অভিব্যক্তির বাস্তব জগতের ও মনোজগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। তাই জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য হল পরমাত্মার উপলব্ধি। যার অন্যতম অঙ্গ হল বুদ্ধিগত ভাবনা বা বিচার। এই বিচার থেকে জ্ঞানযোগী বিবেকে উপনীত হন। জ্ঞানযোগীর বিচারের বিষয় হল পরিদৃশ্যমান এই জগত এবং তার অন্তর্গত নানারূপ বিভিন্ন সত্তা। এই বিচারে জ্ঞানযোগী উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, তিনি বিশুদ্ধ আত্মাস্বরূপ। শ্রী অরবিন্দের মতে সাধারণত এখান থেকে যেভাবে এই পন্থার অনুসরণ করা হয় তাতে যাত্রার অবসান হলো চেতনা থেকে প্রাতিভাসিক সব জগতকে বিভ্রম বলে বর্জন এবং পরব্রহ্মের মধ্যে জীবের এমন চূড়ান্ত নিমজ্জন যে সে আর ফেরে না। কিন্তু এই আত্যন্তিক পরিণতি জ্ঞানমার্গের একমাত্র ফল নয়, কারণ ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে মুখ্য না করে আরো ব্যাপকভাবে এই পথ অনুসরণ করা হলে এতে যেমন বিশ্বাতীতে পৌঁছানো যায় তেমন ভগবানের জন্য বিশ্বজীবনকেও জয় করা সম্ভব হয়। আবার জ্ঞানের আলো না পেলে আমরা অন্ধভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকবো। এই প্রণালীতে আর একপ্রকার ফল হল - মানুষের সমগ্র বুদ্ধি-দৃষ্টিরও দিব্যস্তরে উন্নয়ন, তাদের আধ্যাত্মিকীকরণ ও মানবজাতির মধ্যে দিব্যজ্ঞানের অভ্যুদয়ের জন্য বিশ্বপ্রকৃতির প্রচেষ্টার সার্থকতা সাধন। তাই জ্ঞানযোগ হল অন্যতম এক যোগ সাধনা।

রাজযোগের প্রবর্তক হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। মানুষের সত্তার মধ্যে রয়েছে মন। এই মন হল ঈশ্বরের অতিমানবিক সত্তার অভিব্যক্তি। এই মন বিকশিত হয়ে ঈশ্বরের অতিমানবিক সত্তায় মিলিত হতে চায়। যোগশাস্ত্র অনুসারে মন নানারকম বৃত্তির অধীন। রাজযোগ প্রাণ-বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে চিত্তবৃত্তির নিরোধের দ্বারা সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দের অতীত এক নিষ্ক্রিয় কৈবল্য মুক্তি কামনা করে। রাজযোগী মন ও ইন্দ্রিয়ের

স্বাভাবিক ক্রিয়া গুলিকে প্রশমিত করে অন্তঃপুরুষ চেতনার উচ্চস্তরে আরোহণ এবং আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি দৈহিক ও প্রাণিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এক আন্তরশক্তির স্ফুরণ ঘটান। যোগের ভাষায় ঐ শক্তি হল কুণ্ডলিনী শক্তি। প্রাণশক্তির দ্বারা ঐ কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে এক ভূমানন্দের দিকে অগ্রসর হওয়া রাজযোগের সাধন প্রণালী। রাজযোগে শারীরিক জীবন থেকে দূরে থাকার প্রবৃত্তি জন্মায়। পূর্ণযোগী মনে করেন যে রাজযোগীর যা উদ্দেশ্য তাতে শুধু ব্রহ্মের নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় অবস্থারই উপলব্ধি হয়, তার সগুণ-সক্রিয় লীলাময়রূপের বিস্মরণ ঘটে। পূর্ণযোগী রাজযোগের আত্মসংযম প্রভৃতি গ্রহণ করলেও চিত্তবৃত্তিকে বিনষ্ট করতে চান না, লীলাময় ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ এর উপযোগী করে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হন। রাজযোগের মতো পূর্ণযোগের প্রক্রিয়ার শুরু কুণ্ডলিনীর জাগরণের মাধ্যমে নয়, পূর্ণযোগের সাধনা আরম্ভ হয় উর্ধ্ব থেকে চির-জাগ্রত-চেতন সচ্চিদানন্দময়ীকে আত্মসমর্পণ মধ্যে দিয়ে আবাহনের মাধ্যমে। তবে শ্রী অরবিন্দ বলেন ব্যক্তিগত সমাধি আমাদের লক্ষ্য নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের সমগ্র চেতনাকে এই মর্ত্যের পৃথিবীতে নামিয়ে এনে দিব্যজীবন সকলের জন্য প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য। যা কেবল রাজযোগ দিতে পারে না।

ভক্তিযোগে বলা হয়, মানুষের সত্তার মধ্যে হৃদয় আছে, হৃদয় থেকে আসে আবেগ, আর আবেগ থেকে আসে ভক্তি, প্রেম, ঈশ্বরের প্রেমময় অভিব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাই মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের হৃদয়ে মিশে যেতে চায়। এজন্য প্রয়োজন ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের প্রধান লক্ষ্য হল প্রেম ও আনন্দ লাভ করা। তিনি উপলব্ধি করেন যে জগৎ ঈশ্বরের লীলা, আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে এর গতি, আর মানবজীবন এর চরম পর্যায়। ভক্তিযোগে মানবজীবনের আবেগময় সম্পর্ক গুলি ব্যবহৃত হয় অনিত্য জাগতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নয়, আনন্দঘন ভগবানের তৃপ্তিসাধনে। তাই ভক্তিযোগে সাধকের সমগ্র ভাবাবেগ ও সৌন্দর্যবোধের দিব্যস্তরে উন্নয়ন, তাদের আধ্যাত্মিকীকরণ ও মানবজাতির মধ্যে প্রেম ও আনন্দের আগমনের জন্য বিশ্বপ্রকৃতির প্রচেষ্টার সার্থকতা সাধন সম্ভবপর হয়।

কর্মযোগে বলা হয় মানুষের সত্তার মধ্যে ইচ্ছাশক্তি আছে। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে মানুষ কর্ম করে। কর্মযোগের মূল কথা হল - অহমাত্মক উদ্দেশ্য ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, জাগতিক ফল প্রাপ্তির আশায় কর্মপ্রচেষ্টা ত্যাগ। এই ত্যাগের দ্বারা কর্মযোগীর মন ও সঙ্কল্প এতই শুদ্ধ হয় যে তিনি অনুভব করেন - এক ভাগবত সঙ্কল্পই তার সকল কর্মের শাসক ও পরিচালক। এই অনুভবে তিনি তাঁর সকল কর্মকে পরম সঙ্কল্পের নিকট উৎসর্গ করেন। কর্মযোগে কেবল সকামকর্ম ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। প্রধানত মানুষকে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দেওয়া হয়েছে কর্মযোগে।

হঠযোগ চায় দেহের মধ্যে ভগবানের স্পর্শ লাভ করতে। মানুষের অন্যতম সত্তা হল তার দেহ। হঠযোগে যোগী দেহ ও প্রাণের শুদ্ধি করে অসীম শক্তি লাভ করতে চান। তাই হঠযোগের উদ্দেশ্য হল কায়াশুদ্ধির দ্বারা ভগবানের অমৃতত্ত্বের আস্বাদন লাভ করা এবং দেহকে অনন্তশক্তি ধারণের যোগ্য করে তোলা। হঠযোগী চান প্রকৃতিকে সংশোধন করে এমন একটা ভারসাম্য আনতে যাতে দেহ অফুরন্ত প্রাণশক্তির অন্তঃপ্রবাহ ধারণে সক্ষম হয়। হঠযোগে যৌগিক প্রক্রিয়া গুলি আসন, প্রাণায়াম, প্রভৃতি। হঠযোগী দেহকেই একান্তভাবে আশ্রয় করবার ফলে নানারূপ যৌগশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে ভগবানকে হারাতে বসেন। তাই হঠযোগী চান দেহশুদ্ধি। তবে পূর্ণযোগী দেহের সিদ্ধি চান তাঁর নিজের জন্য নয়, দেহের সম্যক্ রুপান্তর চান ভগবানের আত্মপ্রকাশের জন্য।

উল্লেখিত জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, হঠযোগ, কর্মযোগ হল তত্ত্বতঃ বৈদান্তিক। বৈদান্তিক যোগসাধনা মাত্রই সাধক সত্তার বিভিন্ন স্তরকে আশ্রয় করে জ্ঞানের আলোকে অগ্রসর হন ভগবানের 'সৎ'-স্বরূপকে উপলব্ধি করতে। পুরুষের নিজ চেষ্টা ও তপস্যা বৈদান্তিক যোগের প্রাণ। কিন্তু তান্ত্রিক যোগ ভগবানকে শক্তিরূপে উপলব্ধি করতে চায়। জ্ঞানের পরিবর্তে শক্তিকেই তান্ত্রিকযোগে সাধনার পথপ্রদর্শক হিসাবে মানা হয়, কারণ তান্ত্রিকের চোখে শক্তি অচেতন জড়াত্মিক নয়, চিন্ময়ী। তাই বৈদান্তিক যেখানে 'শক্তি'কে উপেক্ষা করে 'সৎ'- কেই বড় করে দেখতে চান, তান্ত্রিক সেখানে 'সৎ'-কে বিস্মৃত হয়ে 'শক্তি'-র পূজতেই মগ্ন থাকেন। শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগে সকল যোগের সমন্বয় ঘটেছে, সকল যোগের সার সংগৃহীত হয়েছে - "হঠযোগের কায়াচর্চা, রাজযোগের আত্মসংযম, জ্ঞানযোগের ধ্যানধারণা, ভক্তিযোগের আত্মসমর্পণ, কর্মযোগে কর্ম নিবেদন, তান্ত্রিকযোগের শক্তি সাধনা সবই"[৫] মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

শ্রী অরবিন্দের মতে কর্ম, জ্ঞান, ও ভক্তির মধ্যে সত্যকার কোন বিরোধ নেই। জ্ঞান যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন দেখা যায় যে সেই পূর্ণজ্ঞান থেকেই ফুটে উঠে পরাশক্তি, আবার পূর্ণজ্ঞান থেকেই উৎপত্তি হয় সেই দিব্য কর্ম যা পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলে, যা এক নতুন সৃষ্টির নতুন অভিব্যক্তির জন্ম দেয়। প্রাচীন জ্ঞানযোগে কর্মের সেরকম কোন স্থান ছিল না; কর্মের প্রয়োজন দেখা গিয়েছিল পাপক্ষয় বা আত্ম শুদ্ধির জন্য। সকল পূর্বসংস্কার দূরীভূত হয়ে শুদ্ধজ্ঞানের যখন উদ্ভব হয়, কর্ম তখন নিজে থেকেই খসে পড়ে, কারণ জ্ঞানের প্রজ্বলিত বহ্নিতে কর্মের মূল উৎস বাসনা কামনা সব নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়ে যায়। আবার এই জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃত ভক্তিরও কোন সঙ্গতি থাকতে পারে না। জ্ঞানযোগী সত্যকে এক নির্বিশেষ সত্তারূপে উপলব্ধি করেন। জীবের সাথে জীবের ভেদ, জীবের সাথে জগতের ভেদ, ব্রহ্ম থেকে জীব ও জগতের ভেদ, এই সর্বপ্রকার ভেদই নিশ্চহ্ন হয়ে যায়, থাকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ অনন্ত সত্তা আর যোগীরও ব্যক্তিত্বের অবসান হয়ে যায় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ সত্তার মধ্যে। এখানে তাহলে ভক্তির স্থান কোথায় ? ভক্ত ও ভগবানের কোন পার্থক্যই যেখানে স্বীকৃত নয়, ভক্তি সেখানে অর্থহীন। শ্রী অরবিন্দের মতে ভগবান অদ্বিতীয় হয়েও বহু, অথবা অদ্বিতীয় বলে তাঁর বহুল প্রকাশ। প্রকৃত অখণ্ডতা তাই যাকে অনন্ত, বহুত্ব দিয়ে যাকে বিভক্ত করা যায় না, যে অখণ্ডতা সহস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেও নিজের অদ্বৈত রূপ অক্ষুণ্ণ রাখে। সত্তার দিক থেকে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন হলেও, প্রকাশের দিক থেকে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশস্বরূপ। তাই জীব ও পুরুষোত্তমের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য ভক্তিবন্ধন চিরকাল বিদ্যমান। তাহলে দেখা গেল যে, জ্ঞান ভক্তির বিরোধী হওয়া দূরের কথা, তা বিশুদ্ধ ভক্তির ভিত্তিস্বরূপ। কর্মের সাথে জ্ঞানের এই নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান। পূর্ণযোগের সাধকও তেমনি অন্তরে নিয়ত, নিশ্চল আত্মপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বাইরে তার মধ্যে দিয়ে অবিরাম কর্মস্রোত বয়ে যায়, ভগবানের লীলাময়ী শক্তি নিজের ইচ্ছামত তার সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং পূর্ণযোগীর জীবনে জ্ঞান হবে কেন্দ্রস্থল; জ্ঞানের ভিত্তিতে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ ভক্তি বিকশিত হবে, তেমনি আবার অপ্রতিহত দিব্য কর্মের উৎস খুলে যাবে।

মুক্তি, শুদ্ধি, সিদ্ধি ও ভক্তি - পূর্ণযোগের এই চতুর্বিধ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমগ্র বিশ্বমানবকে নিয়ে। ভগবান বিজ্ঞানশক্তিকে নামিয়ে এনে মানুষের জাগ্রত চেতনা প্রতিষ্ঠা করা, এবং তার সাহায্যে সমগ্র সত্তার রূপান্তর সাধনের অর্থ হল প্রকৃতির বিবর্তন-ধারার মধ্যে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে নিরন্তর কাজ করে চলেছে তাকে সার্থক করা তোলা। প্রকৃতির মধ্যে দেখতে পাই যে ক্রমোন্নতির ফলে চেতনার উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তির বিকাশ সাধন হয়ে চলেছে। এই অভিব্যক্তিধারার

প্রথম অবস্থা অচেতন জড়, পরবর্তী অবস্থা অচেতন বা উদ্ভিদ, তারপর অর্ধচেতন পশুপক্ষী এবং সর্বশেষ আবির্ভূত হয় চেতনার মানসশক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি মানব। এখন মানুষের ঊর্ধ্বমুখী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালিয়ে চেতনার ঊর্ধ্বতর রূপকে, ভগবানের অতিমানস শক্তিকে নামিয়ে এনে প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই প্রতিষ্টা সম্পূর্ণ হলে এক নবসৃষ্টি সূত্রপাত হবে, মানুষের মধ্য থেকে অভুদ্যয় হবে অতিমানবের। মানুষ থেকে অতিমানবের জন্ম, জড় থেকে উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদ থেকে প্রাণীর যে জন্ম তা থেকে অনেকাংশে পৃথক। মানবকর সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি নিজের ইচ্ছায় কাজ করে, সৃষ্ট বস্তুর থেকে কোনরকম সাহায্য ব্যতীত। কিন্তু মানুষ আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, তাই মানুষের সাহায্য ব্যতীত মানুষের সত্তাকে রূপান্তরিত করে কোন মহত্তর সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই কারণেই চাই যোগ অর্থাৎ পরমসত্তার সাথে মানবতার যোগ। এই যোগের ফল হবে শুধু মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।

সক্রিয়ভাবে ভগবদলীলায় অংশগ্রহণ করার অপর নাম ভুক্তি। ভক্তির মধ্যে দিয়ে জীবন্মুক্ত পুরুষ মানব সংঘের সমষ্টিগত মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দেয়। চতুর্বিধ পরমার্থ লাভ করার জন্য পূর্ণযোগ সাধনায় - একদিকে যেমন আরোহণের প্রয়োজন আছে, অন্যদিকে আবার অবরোহণেরও প্রয়োজন। একদিকে যেমন পার্থিব চেতনা অতিক্রম করে তুরীয় ধামে উঠে যাওয়া প্রয়োজন, অন্যদিকে আবার তুরীয়লোক থেকে নেমে এসে তুরীয় শক্তিকে পার্থিব চেতনার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। অধ্যাত্ম-সাধনার এই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ হয় পূর্ণযোগ। তাই শ্রী অরবিন্দ চান সামগ্রিক বিকাশ এবং সম্পূর্ণ বিকাশ। শুধু জ্ঞানের বিকাশ কিংবা শুধু দেহের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কিংবা কেবল গভীর ভক্তি আমাদের সমগ্র সত্তার আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়। প্রয়োজন হল দৈহিক, মানসিক এবং সত্তাগত পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন সম্ভব পূর্ণযোগের দ্বারাই। আর এ কারণেই শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত যোগকে বলা হয় 'অখণ্ড যোগ'(Integral Yoga)।

তথ্যসূত্র:

1) বসু, শ্রীসত্যকুমার, সম্পা, শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ (শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা, ১৯৭২), পৃ. ১৬৮।
2) শ্রীঅরবিন্দ, Lights on Yoga, (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২য় সং, ১৯৮৭), পৃ. ২।
3) শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পুনর্মুদ্রণ ২০০১), পৃ. ২২৬।
4) শ্রীঅরবিন্দ, The Riddle of This World (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২য় সং, ১৯৯৬), পৃ. ২।
5) ভট্টাচার্য, পশুপতি, দিব্যজীবনের সন্ধানে, (শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কোলকাতা, ৮ম মুদ্রণ, ১৯৯৭), পৃ. ৬৬।

গ্রন্থপঞ্জী:

1) ভট্টাচার্য, পশুপতি, দিব্যজীবনের সন্ধানে, (শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কোলকাতা, ৮ম মুদ্রণ, ১৯৯৭)।
2) শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পুনর্মুদ্রণ ২০০১)।
3) শ্রীঅরবিন্দ, The Riddle of This World (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২য় সং, ১৯৯৬।
4) শ্রীঅরবিন্দ, Lights on Yoga, (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২য় সং, ১৯৮৭)।
5) অনির্বাণ, যোগসমন্বয় - প্রসঙ্গ, (শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা, ২য়, সং, ১৯৮৭।
6) চক্রবর্তী, রণজিৎ, যোগীরাজ শ্রীঅরবিন্দ (প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১ম. প্র. ১৯৮২)।
7) মজুমদার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দের যোগ-জীবন ও সাধনা (শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কোলকাতা, ২য়, পরিবর্ধিত সং, ১৯৭৬)।
8) মুখোপাধ্যায়, যুগলকিশোর, পূর্ণযোগের সাধন ও পদ্ধতি (শ্রী মীরা ট্রাস্ট, পণ্ডিচেরী, ২য় মুদ্রণ ২০০৭)।